Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 254 - 264
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলন : একটি বিশ্লেষণ

মানস কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ডোমকল কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID : manasdas725@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communalism, Secularism, Communal Award or MacDonald Award, Hindu-Muslim Unity, Religious Intolerance, Religious Fanaticism, Two-Nation Theory.

Abstract
Sarat Chandra Chattopadhyay is one of the legendary authors in Bengali literature, whose works consistently address socio-economic disparities, the establishment of women's rights, and above all, the promotion of humanitarian values and communal harmony. A closer analysis of his writings reveals that during the first half of the 20th century, when British imperialism exacerbated communal tensions and disrupted life in India, Sarat Chandra endeavoured through his literature to foster Hindu-Muslim unity, religious tolerance, and mutual respect.

His personal life and his novels and short stories show him as a devout humanitarian who believed that service to the nation was the true religion, transcending narrow religious divisions. His anti-communal stance and mind-set are evident in every aspect of his literary work. He sensitively discussed communal conflicts and emphasized the urgent need to resolve them. However, it is surprising that certain so-called "progressive" literary critics of our country did not recognize his worth. Instead, they labelled him as "conservative," a "staunch Hindu," "anti-Islam," or even "Muslim-hater" and "communal." These critics cited various statements by Sarat Chandra to support their claims.

The purpose of this research paper is to examine from a historical perspective how justified it is to accuse Sarat Chandra of being 'communal' or 'anti-Muslim' and to assess the validity of such statements within the political context of his time. Furthermore, this research will explore how Sarat Chandra's literary works reflected communal harmony, the historical context behind his writings, and how he encouraged people to transcend religious boundaries and embrace unity through his literary creations.

Discussion

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমন্বয় ঘটেছে। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করে। যা কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। প্রথমেই বলে নেওয়া উচিৎ 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে আমরা মূলত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকেই বুঝি। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝায় পরস্পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হানাহানি। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রিস্টান প্রভৃতি নানা ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বাস হলেও যেহেতু সংখ্যাগত দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য বেশি তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারায় মূলত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রসঙ্গটিই অধিক গুরুত্ব পায়। আবার সাম্প্রদায়িকতার ধারণাটি কেবলমাত্র ধর্মের সাথেও সম্পর্কিত নয় - জাতিভেদ, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা এর অন্তর্ভুক্ত। ড. বিপান চন্দ্রের মতে, -

> "Communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests. It is the belief that in India Hindus, Muslims, Christians and Sikhs from different and distinct communities which are independently and separately structured or consolidated."[১]

অর্থাৎ -

> "সাম্প্রদায়িকতা হল এমন এক বিশ্বাস যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল সেই বিশ্বাস, যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত।"[২]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এই সকল বিরোধের মূলে ছিল ভ্রান্তবুদ্ধি ও অতিশয় ধর্মোন্মাদনা, তথাপি এই বিরোধ যে আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, রাজনীতি ও সমাজ জীবনকে পুনঃপুনঃ পঙ্কিল করে তুলেছে, অগণিত নিরাপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে, সাময়িকভাবে প্রচুর সংখ্যক সুস্থ মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, অত্যাচারী ও লুণ্ঠক বিদেশী শাসক শ্রেণির হাত শক্ত করেছে এবং পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানকে চরমতম দুর্ভাগ্যের অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেছে— এ এক নিষ্ঠুর অবিতর্কিত ও যন্ত্রনাদায়ক সত্য।

বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্কই থাকে না। কিছু স্বার্থপর মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরল, সল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও ধর্মোন্মোদনা-প্রবণ মানুষকে অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তাদের বারুদের স্তূপে পরিণত করে এবং এক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, কোন রকমে আগুনের একটি স্পর্শ পেলেই তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রথমেই দরকার মানুষের মধ্যে থেকে ধর্মান্ধতার অবসান ঘটানো। 'সব ধর্মের সারকথা যে একই, পার্থক্য কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠানের' মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার করতে পারলে তবেই এই ধ্বংসাত্মক বিপদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। আর এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্রনায়ক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সকলেই চিন্তিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর বিরামহীন সংগ্রাম সকলের স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথও 'হিন্দু-মুসলমানের সমকক্ষতার মধ্যে মিলন'[৩]-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন আজও হয়নি। তাই এই বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মানবতার পূজারী শরৎচন্দ্র ছিলেন সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হলেও কখনোই অপর ধর্মের মানুষকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। তিনি দেশ সেবাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ।"[৪]

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই জাতি-ধর্মকে বড় করে দেখা নয়, মানুষের অভ্যন্তরে থাকা মানবিক সুকুমার বৃত্তির সুপ্রকাশই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। চিন্তায়, দর্শনে তিনি ছিলেন এদেশের বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের দেশের কিছু 'প্রগতিবাদী' সাহিত্য সমালোচক[৫] শরৎচন্দ্রকে সে মূল্য দেননি বরং তারা তাঁকে 'রক্ষণশীল', 'গোঁড়া হিন্দু', 'ইসলাম ধর্ম বিরোধী', 'মুসলমান বিদ্বেষী', এমনকি 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে শরৎচন্দ্রের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (এক), 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' (দুই) এবং 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' — শীর্ষক বক্তৃতা ও প্রবন্ধে উল্লেখিত বেশকিছু মন্তব্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেন। যেমন 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, -

> "বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে— হিন্দুর সঙ্গে মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন", বা "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই", অথবা "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে— এ দেশে তাহার চিত্ত নাই" ইত্যাদি।[৬]

কিন্তু এগুলি যে শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য সাধনার মূল ধারণা নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী কিছু মন্তব্য তা যেমন তাঁরা বিচার করেননি, তেমনি এই রচনাগুলির প্রেক্ষাপট ও তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থারও বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। আর সেই কারণেই এই ভাষণ বা রচনায় শরৎচন্দ্রের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাধারার মূল সুরের বিরোধী কিছু মন্তব্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত কথা রয়েছে তার অর্থ অনুধাবন করতে এনারা সক্ষম হননি। এখন প্রশ্ন হল, এইভাবে একজন মানুষের শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কোনও মন্তব্যের ভিত্তিতেই কি তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা বা মূল্যবোধের মূল্যায়ণ করা যুক্তিসঙ্গত?

যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এত বিতর্কের সূত্রপাত শরৎচন্দ্র 'বর্তমান হিন্দু–মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক সেই বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে[৭] এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দু সংঘ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। তাছাড়া ঐ একই সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসের 'শুদ্ধি অন্দোলন' নামেও অপর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। বস্তুত এই দুটি রচনা প্রকাশের জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনগুপ্তের ছয় মাসের কারাদন্ড হয় এবং পত্রিকাটিকে বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।[৮] এখন যদি ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে শরৎচন্দ্রের আলোচ্য উক্তিগুলির প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। মনে রাখা দরকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট-এ একটি উগ্র হিন্দুবিরোধী বিক্ষোভ হয়, এতে ১৫৫ জন নিহত হন। কোলকাতায় ১৯২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে পর পর তিনবার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়। ঐ একই বছরে ঢাকা, পাটনা, রাওয়ালপিন্ডি ও দিল্লীতে সংঘর্ষ দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ছিল যুক্ত প্রদেশে। এখানে ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে প্রায় ৯১টি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৯] খ্রিস্টোফ জেফ্রেল্ট (১৯৯৬) এই পর্বের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, খিলাফতের ছত্রছায়ায় মুসলমানদের যে সমাবেশ ঘটেছিল তারই ফলে হিন্দুদের মধ্যে হীনমন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ জেগে ওঠে। তাই হিন্দুরা আক্রমণাত্মক মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাল্টা সমাবেশে নামে।[১০] পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে আর্য সমাজ শুরু করে উগ্র শুদ্ধি অভিযান এবং হিন্দু মহাসভা আরো সক্রিয় হয়। ঐ সময়েই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। আর এই সব বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সমাবেশের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 254 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯২০-র দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[১১] এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধের উদ্দেশ্যে মহাত্মাগান্ধী দীর্ঘ একুশ দিন (১৮-ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ৮-ই অক্টোবর ১৯২৪) অনশন করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি শান্ত হল না। বরং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক দিনের পর দিন আরও তিক্ত হয়ে উঠলো। সাম্প্রদায়িকতার বলি হলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারান। এই সময় দুই সম্প্রদায়েরই কিছু নেতা এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ মেটাতে সচেষ্ট হন। ডাঃ আনসারী ও লালা লাজপৎ রায় এই উদ্দেশ্যে একটি 'জাতীয় চুক্তিপত্র' (Indian National Pact) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' সম্পাদন করেন। তিনি ঐকান্তিকতার সাথেই চেয়েছিলেন হিন্দু–মুসলমান মিলন। কিন্তু তা ছিল নিছক রাজনৈতিক সমঝোতা। তাই তো ১৯২৫ খ্রিঃ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (২২-২৩শে মে, ১৩২৬ খ্রিঃ) 'হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট' বা 'সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট' বাতিল হয়ে যায়। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে পুনরায় চিড় ধরে। দেশের নানা স্থানে হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। মদন মোহন মালব্য, লালা লাজপত রায় প্রমুখ 'হিন্দু মহাসভার' সঙ্গে যুক্ত হলেন, অপরদিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি 'তনজীম' ও 'তব্‌লীগ' আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এই পর্বে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যেন ইংরেজদের মনেও নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। হারকোর্ট বাটলার উল্লসিত হয়ে রিডিংকে লেখেন—

> "Hindu and Mussalman hate each other so much that they have not much time to hate us."[১২]

এই অবস্থায় ১৯২৬ সালে গান্ধীও রাজনীতি থেকে সরে যান। চর্তুদিকে হতাশা ও অবসাদ লক্ষ্য করে এবং একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্যদিকে হিংসাশ্রয়ী ঘটনার বাড়াবাড়ি দেখে গান্ধীজী দুঃখ করে লিখলেন—

> "My only lies in payer and answer to prayer."[১৩]

সুতরাং শরৎচন্দ্রের এই রচনা প্রকাশের বহু আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণে ভারতবর্ষে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আর তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও ঐক্যকরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ব্যতীত কেবলমাত্র সমঝোতা করে হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব নয়। সেকারণেই তিনি খেদের (দুঃখের) সাথেই বলেছেন—

> "হিন্দু-মুসলমান মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোনো কাজেই আসে নাই।"[১৪]

কেবল তিনি নন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই জোড়াতালি দিয়ে যে ঐক্যের প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে সেদিন অনেকেই মত প্রকাশ করেছিলেন। মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বলেছেন, -

> "যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদের টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল না। একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে। সভায়, সমিতিতে, কংগ্রেসে, কনফারেন্সে, গোলটেবিলে, মিলন বৈঠকে এদের যে ঐক্য সাধনা, বস্তুতঃ সেটি হল সান্নিধ্য সাধনের প্রয়াস; তাতে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের হিসাব প্রচুর, মনের যোগ-বিয়োগের, চিত্তের লেন-দেনের কথা সেখানে নেই।"[১৫]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, সত্য ছিল না।"[১৬]

শুধু তাই নয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনা ছাড়া অধিকাংশ মুসলমানেরা[১৭] ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী জাতিয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বহুলাংশে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কংগ্রেসের মাত্র ৬.৫৯ শতাংশ প্রতিনিধিরা ছিলেন মুসলমান। এমনকি সৈয়দ আহমেদ খানের মত মুসলমান নেতারা জাতীয় কংগ্রেসকে একটি 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান' বলেই মনে করত।[১৮] এমনকি স্যার সৈয়দ আহমেদ খান মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে ও কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Loyal Mohammedans' নামক পুস্তিকায় ইংরেজ

শাসকদের প্রতি তাঁর একান্ত আনুগত্য ও অগাধ আস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও পুনরুজ্জীবনে সৈয়দ আহমেদ-এর ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়; তবে তিনিই যে প্রথম হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপণ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন— হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। এমনকি হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—

> "Now suppose that all the English were to leave India, then who would be rulers of India? Is it possible that under these circumstances two nations, the Mohammedan and the Hindu, could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not, …To hope that both could remain equal is to desire impossible and inconceivable."[১৯]

উইলিয়াম হান্টারের বক্তব্যেও উপরিউক্ত মন্তব্যের সমর্থন মেলে।[২০] এমনকি সেই সময় শিক্ষা এবং নবজাগরণের ভাবধারার সঙ্গে যাদের প্রথম সংযোগ ঘটেছিল, যেকোনও কারণেই হোক তাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় মতো হাত বাড়াতে না পারায় তারা আরো পিছনে পড়ে যেতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায়, প্রধানত প্রাগ্রসর হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান অপেক্ষা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে নিজেদের সংগঠিত করে সরকারের আনুকূল্যলাভ তাদের কাছে তুলনামূলকভাবে বেশী গ্রহণীয় বলে মনে হয়। আধুনিক কালের অনেক চিন্তাবিদও এই বক্তব্যকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।[২১] এমনকি আলি ভ্রাতৃদ্বয় (মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি) মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁরা প্রথমে মুসলিম, পরে ভারতীয়। তাই তৎকালীন ভারতীয় মুসলিম সমাজের অধিকাংশ ভারতের মুক্তিকে নিজেদের মুক্তি বলে মেনে নিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন –

> "ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।"[২২]

শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার যে তাঁর মধ্যে কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতাবোধ ছিল না বরং ধর্মের গোঁড়ামি থেকে বেড়িয়ে এসে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সকলকে একত্রিত ভাবে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের হলেও একথা সত্য যে, এই ধর্মীয় অন্ধতার বশবর্তী হয়েই ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটা বিরাট অংশ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে যোগ না দিলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের সুলতান খলিফার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। খিলাফৎ আন্দোলনকারীরা জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে শর্ত আরোপ করে যে, তারা বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে পারে, যদি কংগ্রেস মধ্যযুগীয় এই ইসলামিক রীতিনীতি পুনরুজ্জীবনের এজেন্ডা নিয়ে গড়ে ওঠা খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে।[২৩] দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশায় গান্ধীজী এই প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহু মানুষ এর প্রবল বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্রও এই খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মহম্মদ আলি জিন্নাহও খিলাফৎ আন্দোলনের নিন্দা করে বলেছিলেন —

> "এই আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী একদল ধর্মান্ধ মোল্লা ও উলেমাকে রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা এবং খলিফার পুনর্বাসন অপেক্ষা আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি সমর্থন অনেক বেশি সময়োপযোগী পদক্ষেপ হত।"[২৪]

কিন্তু চৌরিচোরা ঘটনার (১৯২২ খ্রিঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি) পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে খিলাফৎ নেতাদের ভেতর সমঝোতাও দূর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্ক বা মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে খালিফাদের শাসনের বা খিলাফৎ এর অবসান হলে ভারতেও খিলাফৎ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই খিলাফৎ আন্দোলনের নের্তৃবর্গ জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে এসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। তারই সাথে সাথে গান্ধীজীর

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল। সেই দিক থেকে দেখলে "মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে— এ দেশে তাহার চিত্ত নাই" শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি কোথাও নেই বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন–

> "The Hindu-Muslim unity brought about by Gandhi in 1920-21 was artificial in character and did not produce any real change of heart."[২৫]

শুধু দুঃখের বিষয় এটাই যে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ধর্মীয় অন্ধতাকে অপসারণের যে প্রয়াস কামাল পাশা চালিয়ে ছিলেন প্রগতিশীল তুর্কীরা সেই প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করলেও মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটা অংশ ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এ কারণেই হয়ত শরৎচন্দ্র দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—

> "খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। ...যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এতবড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। ...আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। ...এ ব্যাপারে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এত খানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এত বড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই।"[২৬]

বাস্তবিক পক্ষেই খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে গান্ধীজি মস্ত ভুল করেছিলেন। এর ফলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং খিলাফৎ আন্দোলন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় চেতনার সঞ্চার করেছিল তারই পরিণামস্বরূপ পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠতে পেরেছিল।

শরৎচন্দ্রের অপর যে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল সেটি হল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এবং ১৭-ই জুলাই কলকাতার টাউন হলে[২৭] প্রদত্ত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (এক)' এবং 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (দুই)' শীর্ষক দুটি ভাষণের কিছু মন্তব্যকে ঘিরে। শরৎচন্দ্রের বক্তব্যকে উল্লেখ করেও অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান বিরোধিতার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার আগে আমাদের দেখতে হবে এই দুটি সভা আহূত হয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত ভারত শাসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই আইনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখতেই ব্রিটিশ সরকার এই নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩২ সালের ১৬-ই আগষ্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি' গ্রহণ করে এই আইন ছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন। ১৯৩২ সালে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি অনুযায়ী মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করেছিলেন। এই নীতির মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মধ্যেও (বর্ণ হিন্দু ও নিম্ন হিন্দু) বিভেদ ঘটানোর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। এই নীতি ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন (২০ শে সেপ্টেম্বর থেকে)। শরৎচন্দ্রও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতার টাউনহলে বাঁটোয়ারা বিরোধী এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ এই দুই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখান করেন। কিন্তু তাঁদের সমবেত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' স্বীকার করে নিয়ে ভারত ভাগ ও ধর্মভিত্তিক দুটি রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হয়েছে। দেখা গেল শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাই যথার্থ। তিনি দুই সম্প্রদায়ের মিলন চাননি তা নয়, কিন্তু তিনি একে 'দুষ্পাপ্য বিধি' বুঝেছেন এবং এই নিধি একা হিন্দুর গরজে মিলবে না, মুসলমানদেরও গরজ চাই— দু'দশজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নয়— সমগ্র মুসলিম জনতার চেতনায় এই ঐক্যের বাসনা চাই। এখানে শরৎচন্দ্র যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন, ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রথম থেকেই প্রয়োজন মতো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই তোষণ করে গেছে। এই উদ্দেশ্যে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা হিন্দুদের কাছে টেনে নেয়

আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করলে শুরু হয় মুসলিম তোষণ। এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখার যে কূটনীতি অনুসরণ করে গেছে শরৎচন্দ্র তার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি অভিভাষণে শরৎচন্দ্র মূলতঃ সুকৌশলে ইংরেজদের বিভেদ সৃষ্টি করার চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। দেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার যে সুদক্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান কোন অংশের জনসাধারণের যে এতে লাভ নেই— এ কথাগুলিকেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় উত্থাপন করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত দুটি নিবন্ধে শরৎচন্দ্রের সাম্প্রদায়িক নয়, বরং অনবদ্য অসাম্প্রদায়িক মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে কেবল তৎকালীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা উদ্ভবের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তাই নয়, অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি এই সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করতেন ধর্মের মোহ থেকে মুক্তি ছাড়া এবং ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসা ছাড়া প্রকৃত অর্থে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, -

> "ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনোদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে— কোনো ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এত বড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।"[২৮]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি যেকোনো ধর্মের গোঁড়ামি ও ধর্মের প্রতি মোহকে লজ্জাজনক ও বর্বরতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে আপাতভাবে মুসলিম বিরোধিতার সুর শোনা গেলেও তিনি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করেন নি, বরং মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান সমাজের সংঘর্ষের আভাসরূপে তিনি সমস্যাটাকে দেখাতে চেয়েছেন এবং এই সমস্যার সমাধানকল্পে শরৎচন্দ্র মূলত মুসলিম সমাজের গোঁড়ামিমুক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।[২৯] সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে এই ধর্মান্ধতা (ধর্মতন্ত্র) ও ধর্ম কি একই না স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখনীই আমাদের বড় দিগ্‌দর্শন –

> "ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ...ধর্ম বলে মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে, ধর্মতন্ত্র বলে মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার কথা। মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।"[৩০]

তবে তিনি যে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বিরোধিতা করেছেন তা নয়, হিন্দু ধর্মে আচারের নামে মিথ্যা কুসংস্কার ও হিন্দু সমাজপতিদেরও ধর্মীয় শাস্ত্রাদির অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও শাণিত আঘাত হেনেছেন। যাঁরা শরৎচন্দ্রকে 'ইসলামধর্ম বিদ্বেষী', 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বা 'রক্ষণশীল' ও 'গোঁড়া হিন্দু' বলে সমালোচনা করেন তারা হইতো সকলেই একটা সহজ প্রশ্ন এড়িয়ে যান যে, তিনি যদি রক্ষণশীলই হতেন তাহলে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এত শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন কেন? তিনি কোনোরকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা পরিচালিত হননি; হিন্দু বা মুসলমান বা ব্রাহ্ম সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত করেছেন। এমনকি শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যচ্যুত হননি। একথাও অজনা নয় যে, গোঁড়া হিন্দুসমাজ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এতদূর পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, এমনকি তাঁকে 'একঘরে' করা হয়েছিল। তাঁর ধোপা, নাপিত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩১] সুতরাং ধর্মের গোঁড়ামিকে যিনি বর্বরতা ও লজ্জাকর বলেন, তাঁকে আমরা কি করে সাম্প্রদায়িক বলতে পারি?

শরৎচন্দ্র মনে করতেন একমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় প্রভেদ তাদের কখনও এক হতে দেয়নি। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। তাঁর মতে— 'হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের'।[৩২] তাই রীতি-নীতি, চাল-চলন, আদব-কায়দা, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়েই হিন্দু মুসলমানে মিল থাকলেও ধর্ম তাদের ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর একমাত্র শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমেই মানুষের মধ্য থেকে এই ধর্মীয় সংকীর্ণতা দূরীভূত করা সম্ভব।[৩৩] এতদসত্ত্বেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য তিনি আক্ষেপও

করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন কারোর একার প্রচেষ্টায় এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যলাভ সম্ভব নয় এর জন্য সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে। তাঁর ভাষায়—

> "জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"[৩৪]

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে আস্থাশীল ছিলেন এবং সমস্ত রকম ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান ঘটিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে একে অপরকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে তবেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একজন সাহিত্যিক হিসাবেও শরৎচন্দ্র তাঁর দ্বায়িত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ঠ সচেতন ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সাহিত্যই একমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে পারে। এ কারণে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে যে সভা আহূত হয় তাতে তিনি বলেন—

> "হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য চাই। কেননা সাহিত্যিকের কোন ধর্ম নেই। সাহিত্যসেবকরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীশ্চান হোক তবু তারা পর নয়, আপনার জন।"[৩৫]

ধর্মান্ধ উগ্র মুসলমানদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি কিছু অসহিষ্ণু ও কটু মন্তব্য করেছিলেন। আবার মুসলিমদের মধ্যে যারা এসব উগ্রতার চর্চা করেন না তাদের প্রশংসাও করেছেন। হয়তো শরৎচন্দ্রের এই সমালোচনায় শিক্ষিত মুসলমানরা দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু সেই সময়ে বলা তো দূরের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেননি যে শরৎচন্দ্র মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছেন। তাই যদি হত তাহলে ঐ ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিম সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীরা পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যেতেন না।[৩৬] সম্ভবতঃ সেই সময়ে তিনিই একমাত্র অমুসলিম সাহিত্যিক যিনি এই সুযোগ পেয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে শরৎবাবু সম্পর্কে এতটুকু বিরুদ্ধতা বা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে কি এটা সম্ভব হতো! সর্বোপরি এই সাহিত্য অধিবেশনে তিনি অন্নদাশংকর রায়ের একটি উক্তিরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন যে, "অস্থির সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কখনও হবে না। আপস হতে পারে, জাতীয় ঐক্য, আত্মীয়তা কখনও হবে না।" এই নেতিবাচক উক্তি শরৎচন্দ্রের মনে নিরতিশয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি এর প্রতিবাদও করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনন জগতে পরিবর্তন ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুতরাং হিন্দু-মুসলিমের মিলনের প্রশ্নে তাঁর কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তা এখানে উপলব্ধি করা যায়।

শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যেমন কোনও কোনও মুসলমান সাহিত্যিক কর্তৃক সমালোচিত হতে হয়েছে, তেমনি বেশ কিছু উদার-পন্ডিত সাহিত্যসেবী মুসলমান বন্ধু কর্তৃক তিনি প্রশংসিতও হয়েছেন। শুধু তাই নয় কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, জাহান-আরা-চৌধুরী প্রমুখ শরৎচন্দ্রকে মুসলিম সমাজ, তার সমস্যা, দৈন্যদশা নিয়ে সাহিত্য রচনার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে এই অভাব থাকায় তাঁরা অভিমানও করেছিলেন। আর কোনো সাহিত্যিককে নয়, শরৎবাবুর কাছেই এই আবেদন জানিয়েছিলেন। কতটা আপন মনে করায় তাঁরা এটা করতে পেরেছিলেন। শরৎবাবু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবকে বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, যদি বেঁচে থাকেন এরপর তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে তিনি লিখবেন। এমনকি ব্যক্তিগত ভাবেও জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের কথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাই শরৎচন্দ্র ১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত তাঁর ডি. লিট. উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে সমাবর্তন উৎসবে যোগদানের জন্য ঢাকায় উপস্থিত হলে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার জন এণ্ডারসন্ যখন তাকে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য দূর করার জন্য মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করার পরামর্শ দেন, তখন সেই প্রস্তাব তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এবং ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক

জীবনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে ঢাকায় থাকাকালীনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আর ঢাকা থেকে ফেরার এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রয়াত হন।[৩৭] এইভাবে আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর সেই আশা ও প্রতিশ্রুতি অপূরিত থেকে গেছে। এটা শুধু মুসলিম সমাজেরই ক্ষতি নয়, সমগ্র দেশেরই ক্ষতি। সুতরাং মুসলমান সমাজ ও মুসলিম সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকার সামগ্রিক মূল্যায়ণ না করে, দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন সেই সময়কার বিচ্ছিন্ন কিছু মন্তব্যকে ভিত্তি করে শরৎচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বলে অভিহিত করা হয়ত যুক্তিসঙ্গত নয়।

তবে একথাও অনস্বীকার্য, যে কারণই থাকুক না কেন শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের কাছ থেকে এই ধরনের মন্তব্য অপ্রত্যাশিত। তবে তিনি যে মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না বা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তনে কোনও অনুদারতা ছিল না তা তাঁর নিজ লেখাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

> "হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষন যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এই নয় যে, এই দুই প্রতিবেশীর জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না।"[৩৮]

সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চাইতেন না বলে শরৎচন্দ্রকে যারা সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেন, তাঁদের সে ধারণা সত্য নয়।

যদিও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক বা মুসলমান বিদ্বেষী বলা যুক্তি সঙ্গত কিনা তা আলোচনা করার সময় এটা নয়। তার মতাদর্শকে সামনে রেখে আমাদের পরস্পরের জাতিগত-ধর্মগত বিদ্বেষ ভুলে ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কোনরকম ধর্মীয় উগ্রবাদ বা স্থূল জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে না ওঠে পরস্পরকে ভাই বলে জ্ঞান করে একদল কুচক্রী, উভয়ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী গুটিকয়েক মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই আমরা এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিসম্বাদের অবসান ঘটিয়ে কবি কাজি নজরুল ইসলামের স্বপ্নকে পূরণ করতে সক্ষম হব - "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান,/ মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।/ এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি-শশী দোলে।/ এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।/ মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।"

Reference:

১. Chandra, Bipan. Communalism in Modern India, New Delhi, Vani Educational Books, 1954, p.1

২. চন্দ্র, বিপান. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কলকাতা-১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯, পৃ. ১

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, প: ব: সরকার, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ২৪০

৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৮৪

৫. প্রাগুক্ত

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬০

৭. Chatterjee, Joya. Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition (1932-1947), Cambridge, Cambridge University press, 1994, P. 271

৮. শারদীয় নন্দন, ১৩৮২

৯. সরকার, সুমিত. আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা-১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৪, পৃ. ১৯৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, ২০০৪, পৃ. ৩৯৭

১১. Pandey, Gyanendra. The Construction of Communalism in Colonial North India, Oxford University Press, Delhi, 1992, p. 234

১২. ত্রিপাঠী, অমলেশ. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ১৩৩

১৩. Sarkar, Sumit. Modern India (1985-1947), Delhi, Mackmillan, 1983, p. 237

১৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র. 'বর্তমান হিন্দু মুসলিম সমস্যা', শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬০

১৫. 'বুলবুল', মাসিক পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৪৩

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. লোকহিত, 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী (12-শ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৫৬৩

১৭. ব্যতিক্রম ছিলেন বদরুদ্দীন তায়েবজী, আর. এস. সায়ানি, এ. ভিমজি, হামিদ আলি খাঁ প্রমুখ। তাঁরা জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তায়েবজী ১৮৮৭ সালে এবং সায়ানি ১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর. পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু রায়, ওরিয়েন্ট লংম্যান, দিল্লী, ২০০৪, পৃ. ৩৯৬

১৯. Sen, Sachin. The Birth of Pakistan, General Printers & Publication, 2007, p. 42

২০. Hunter, William Wilson. The Indian Musalmans, London, Trubner and Company, 1876, p. 70-82

২১. এই মতবাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ W. C. Smith, Modern Islam in India, London, 1943; A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1948; Abdul Hamid, Muslim Separatism in India : A Brief Survey, Lahore, 1967 ইত্যাদি।

২২. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১

২৩. দেবদাস, ননীগোপাল. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী (১৬০০-১৯৪৭), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯. পৃ. ৪৫-৫২

২৪. গুহ, রায়, সিদ্ধার্থ. ও চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন. আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৬৯৪

২৫. Majumdar, Dr. R.C. History of the Freedom Movement in India (vol. III), South Asia Books Publishers, 1988, P. 424

২৬. বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৫৮

২৭. এলবার্ট হলে সভাপতির ভাষণ: 'বাতায়ন' ১৫-ই শ্রাবণ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. সেন, সুজিত. 'সাম্প্রদায়িকতা রবীন্দ্র ভাবনার একটি দিক', সুজিত সেন (সম্পা.), ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, প্রগতিশীল প্রকাশন, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৬৮

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. কালান্তর, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৬-৮

৩১. রায়, গোপালচন্দ্র. শরৎচন্দ্র, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩
পৃ. ১৬৫ [শরৎচন্দ্র ২৯-৬-১৯১৬ তারিখে তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন— "... জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে' আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়...।" ওই সময় শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। এখানে চিঠিতে 'দেশে আমি একঘরে' বলতে লেখক তাঁর দিদিদের গ্রাম এবং তার আশে পাশের গ্রাম গুলির কথাই বলেছেন।]

৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, প: ব: সরকার, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ৩৬৪

৩৩. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১

৩৪. 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা', শরৎচন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৬১

৩৫. এলবার্ট হলে সভাপতির ভাষণ: বাতায়ন ১৫-ই শ্রাবণ ১৩৪৩

৩৬. ঘোষ, প্রভাস. 'স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদ ও শরৎচন্দ্র', মণ্ডল, তরুণ. (সম্পা.) শরৎচন্দ্র: অনুপম শৈলীতে ভাস্বর মনীষা, সারা বাংলা ১২৫ তম শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী কমিটি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৩০৭

৩৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. 'শরৎচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', বিশ্বনাথ দে (সম্পা.), শরৎস্মৃতি, কলকাতা ৭৩, সাহিত্যম, ১৩৮৪, পৃ. ২৮৫

৩৮. প্রাগুক্ত